বর্তমান উত্তাল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

বর্তমান উত্তাল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ*

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ**

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয়ী উচ্চারণ: 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বাস্তবেও বাঙালিকে দাবায়ে রাখা যায়নি, বরং বাঙালি গর্জে উঠেছে। বাংলাদেশ এখন নিজ অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতুর দেশ।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত, জীবিকার হাহাকার ছিল দিকে দিকে। আজ পদ্মাসেতুর দেশের সার্বিক উন্নয়ন বিশ্বে নন্দিত। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণের প্রত্যয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাঙালি অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ।

আমাদের আজকের বিশ্লেষণের বিষয় হচ্ছে উন্নয়নের পথ-পরিক্রমায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান ও ঘনিয়ে আসা নানা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের অবস্থান।

এই বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব সব দেশেই পড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে। তবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং তার কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এই দুই পরিমন্ডলকে আলাদা বা খন্ডিতভাবে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

আমি শুরুতে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বিবেচনায় নিতে চাই, যা পৃথিবির সব দেশের জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য লক্ষ্যগুলো (১৭টি) এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলোর (১৬৯টি) মধ্যে অগ্রাধিকার দেশে দেশে ভিন্নতর হওয়ার কথা, বিভিন্ন দেশে বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে। টেকসই উন্নয়ন সহজবোধ্যভাবে এরকম সংজ্ঞায়িত করা যায়: সামাজিকভাবে গ্রাহ্য পরিবেশ সম্মত অর্থনৈতিক অগ্রগতি। এই সমন্বিত পথ পরিক্রমায় মূল স্তম্ভ তিনটি: অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশ। এই বিষয়গুলোকে ঘিরে অনেক মাত্রা আছে যেগুলো বিভিন্ন লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিফলিত।

---

* Bangladesh Academy for Securities Markets (Academic Wing of Bangladesh Securities Exchange Commission)-এ আমন্ত্রিত বক্তার উপস্থাপনা, ২৯ মে ২০২২

** ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: মুক্তিযোদ্ধা, অর্থনীতিবিদ, সমাজচিন্তক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ। চেয়ারম্যান, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তখন তৈরি হবে যখন সমাজের সকলে ন্যায্যভাবে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সুফলে অংশীদার হবে। তাই টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীতে একটি অমোঘ তাগিদ হচ্ছে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। অন্য কথায়, বৈষম্য কমিয়ে এনে সুষম অর্থনীতি ও সমাজ গড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু করোনা মহামারির পূর্বেই বৈষম্য বাড়ছিল–দেশে দেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে, পৃথিবীর সর্বত্রই। অক্সফামের এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী এক শতাংশ মানুষের হাতে পৃথিবীর অর্ধেক বা ততোধিক সম্পদ কুক্ষিগত এবং বাকী অর্ধেক অন্য ৯৯ শতাংশ মানুষের মধ্যে প্রকটভাবে শ্রেণী-ভিত্তিক বিভাজিত। তাই করোনা পূর্বকালে বিশ্বব্যাপী প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ ছিলেন অতি দরিদ্র। এছাড়াও পৃথিবীর অর্ধেকের অধিক স্বল্প আয়ের মানুষ ছিলেন অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে বসবাসরত। স্বল্পোন্নত ও স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশসমূহে অগ্রগতি সীমিত থেকেছে। উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দার জের হিসেবে অনেক দেশে মন্দাভাব বিরাজমান ছিল । বিশ্বব্যবস্থায় এবং দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের প্রকোপ উঁচুমাত্রার ও ক্রমবর্ধমান থাকার মূলে রয়েছে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নব্যউদারতাবাদ। এই ব্যবস্থা জোরালোভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত ও দেশে দেশে চাপিয়ে দেয়া কাঠামোগত সংস্কার বা ওয়াশিংটন সমঝোতা। এর বার্তা হলো: সব কিছু বাজারের কাছে ছেড়ে দিতে হবে, সরকারকে ছোট করে আনতে হবে। অর্থাৎ উদার বাজার ব্যবস্থাই আর্থ-সামাজিক গতি প্রকৃতি নির্ধারণের নিয়ামক।

সেই থেকে এই নব্য-উদারতাবাদ বিশ্ব অর্থনীতি এবং দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে চালু রয়েছে, ক্রমান্বয়ে জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তক অষ্ট্রিয়ান-ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ফ্রিড্রিক ভন হায়েক, যা তিনি ১৯২০-৩০ সময়ে প্রচার করেন। তখন না হলেও ১৯৭০-এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৮০-এর দশকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (১৯৭৯-৯০) এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান (১৯৮১-৮৯)-এর হাত ধরে এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে কেবল পণ্য-সামগ্রীর সরবরাহ ও মূল্য-ভিত্তিক লেনদেন মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না। আরো অনেক বিষয় আছে (যথা: ভাল থাকার ধারণা, সংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ, মানবতা, বৈষম্য ইত্যাদি) যা মানুষের চাল-চলন, জীবন দর্শন ও জীবন গঠনে ভূমিকা রাখে। বাজার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়েও, এডাম স্মিথ ও জন মেইনার্ড ক্যাইনস্ স্বীকার করেছেন মানুষের জীবন-যাপনে সামাজিক-সংস্কৃতিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব রয়েছে। যাই হোক, বর্তমানে সাধারণত ফ্রিড্রিক হায়েকের দৌরাত্ম্য চলছে বিশ্বব্যাপী। জাতিসংঘ প্রবর্তিত সবাইকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীও তাতে এ পর্যন্ত চিড় ধরাতে পারেনি।

এখন টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ স্তম্ভ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চূড়ান্ত ভিত প্রকৃতি। প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে উদপাদন ও পরিবহনে বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহারে গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ বাড়তে

থাকে। যার ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়ন বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও যোগাযোগ ও অন্যান্য খাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহারের ফলে গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণ এবং পৃথিবীর উষ্ণায়ন বেড়েই চলেছে। অভিঘাত পড়ছে একাধারে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে ও স্বকীয়তায় এবং মনুষ্যকৃত বিভিন্ন ব্যবস্থায় (যেমন: কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি)।

সম্প্রতি প্রকাশিত (২০২১ ও ২০২২) জাতিসংঘের আন্ত:রাষ্ট্রীয় জলবায়ু প্যানেলের ৬ষ্ঠ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ-১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে বায়ুমন্ডলে পুঞ্জিভুত গ্রীনহাউজ গ্যাস দুই মিলিয়ন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীকে প্রথম শিল্প বিপ্লবের পূর্বের তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর বেশি উষ্ণ না হতে দেয়ার যে লক্ষ্য প্যারিস চুক্তিতে (২০১৫) নির্ধারণ করা হয়েছে তা ২০৩০ থেকে ২০৪০ এর মধ্যে ঘটে যাবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জলবায়ু পরিবর্তনের যে দ্রুত ও ব্যাপক অভিঘাত পড়ছে এবং ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি ও অস্থিরতা বাড়ছে বলে তথ্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে তা বিবেচনায় নিয়ে দেখা যায় বিশ্ববাসীর সামনে এই ঘনীভূত হতে থাকা ধ্বংসাত্মক জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগ আর মাত্র কয়েক বছর আছে, বড়জোর ১০ বছর ।

যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকলে ২০৩০-এর দশকের প্রথমদিক নাগাদ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। কাজেই সুযোগ থাকতে গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণ অনেক বেশি হারে দ্রুত কমিয়ে আনতে হবে, যার কোনো লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মধ্যে এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। উষ্ণায়ন ছাড়াও পৃথিবী জুড়ে বন নিধন ব্যাপকভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে। আর জীববৈচিত্রে ধ্বস নেমেছে এবং প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রয়েছে। এ সকল প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বিশ্ববাসী (দরিদ্র, উন্নয়নশীল ও জলবায়ু ভঙ্গুর দেশগুলো আগে এবং উন্নত দেশগুলো হয়ত কিছু পরে), এমনকি গোটা পৃথিবীই অস্তিত্বের সংকটে পড়ার গুরুতর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেইম ওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCC)-এর আওতায় অনুষ্ঠিত ২৬তম বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তণ সম্মেলনে (কপ-২৬) পৃথিবীর মানুষ ও পৃথিবীকে বাঁচানোর কার্যক্রমে আশাপ্রদ কোনো অগ্রগতি হয়নি। দেখা যাচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের মৌলিক বিষয়গুলোতে অগ্রগতি হয়নি, বরং চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমশ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

এ বাস্তবতায় করোনা মহামারি শুরু হলো ২০২০ সালের গোড়ার দিকে। করোনার বিস্তৃতি রোধ করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত বিধিনিষেধ ও লকডাউনের ফলে বিশ্বজুড়ে উৎপাদন, বাণিজ্য, বিপণন এবং মানুষের চলাচল (আন্তর্জাতিক, অভ্যন্তরীণ) অভূতপূর্বভাবে সীমিত হয়ে পড়ে, যা পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনীতি এবং দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন

নেতিবাচক হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ২০২০ সালে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক পথ এখনও বাকি। বিশেষ করে, সাধারণ মানুষের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সাধারণত এখনও করোনা মহামারির পূর্বাবস্থায় পৌঁছেনি।

২০২১ সালে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে ২০২২ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া ইউক্রেইন যুদ্ধের কারণে ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়েছে যা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ ইউক্রেইন যুদ্ধ মরার উপর খড়ার ঘার মত আভির্ভুত হয়েছে। ইউক্রেইন ও রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে গম (৩০ শতাংশ), ভুট্টা (২০ শতাংশ), বার্লি (৩০ শতাংশ) ও সানফ্লাওয়ারের (৫০ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য সরবরাহকারী। এছাড়া রাশিয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের সবচেয়ে বড় এবং জ্বালানি তেলের দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানিকারক। আবার, রাশিয়া ও বেলারুশ বিশ্ব সার রফতানির এক পঞ্চমাংশের উৎস। এ পণ্যগুলোর দাম অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।[১]

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২২-এর এপ্রিল মাসে খাদ্যের মূল্য সূচক পূর্ববর্তী বছরের এই সময়ের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি যতদিন ধরে এফএও এসব তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে আসছে তার মধ্যে সর্বাধিক। একই সঙ্গে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে ৬০ শতাংশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও সারের মূল্য দ্বিগুণের অধিক হয়ে গেছে। [২]

বিশ্বজুড়ে তাই মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং আরো বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে তা ২০২২-এর জানুয়ারী থেকে ৭ শতাংশের অধিক। প্রকৃতপক্ষে, ফেব্রুয়ারিতে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং মার্চ-এপ্রিলে ৮ শতাংশের অধিক ছিল।[৩] ইউরো জোনে[৪] তা এপ্রিল ২০২২-এ ছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে[৫] একই সময়ে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতে প্রায় একই রকম মূল্যস্ফীতি বিদ্যমান, যা এপ্রিল ২০২২-এ ছিল ৭.৭৯ শতাংশ[৬]। বাংলাদেশে কিছু কম হলেও এপ্রিল (২০২২) মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.২৯ শতাংশে।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং বাড়ছে। ফলে দরিদ্র ও স্বল্প, এমনকি নিম্ন মধ্য আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ইউক্রেইন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ আন্তর্জাতিক বাজারে আরো সমস্যাসংকুল হবে, দাম বাড়বে, মূল্যস্ফীতি বাড়বে। পৃথিবীর সর্বত্রই সাধারণ মানুষ আরো অধিক জীবন জীবিকার ঝুঁকিতে, এমনকি সংকটে পড়বে।

আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারি এবং ইউক্রেইন যুদ্ধ এই ত্রিমাত্রিক ক্রমবর্দ্ধমান সংকট বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর নাজুক ও উথালপাথাল করে তুলতে পারে বলে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গঠিত একটি কমিটি ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন খাত ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগোষ্ঠির বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান নানা সম্ভাবনা ও সমস্যা বিশ্লেষণ করে কমিটি বিভিন্ন লক্ষ্যের আওতায় ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকারের দাবিদার বলে চিহ্নিত করেছে। আর সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সকলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি। অর্থাৎ পুরো প্যাকেজটি হচ্ছে: ৩৯+১। কোন মন্ত্রণায় বা প্রতিষ্ঠান কোন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে এবং কোন দফতর সহযোগিতা দেবে তা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো যখন হচ্ছিল তখন করোনা মহামারি আঘাত হানে।

আসলে ২০১০ সাল থেকে জাতীয় উৎপাদের প্রবৃদ্ধি সুসংহত ও ত্বরান্বিত হতে শুরু করে। এর কারণ হিসেবে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের তৈরি করা অনুকূল নীতি-কাঠামো ও পারিপার্শ্বিকতা এবং সেই বাস্তবতায় কৃষক, কৃষিশ্রমিক, অন্যান্য শ্রমিক, অতিক্ষুদ্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গোষ্ঠীর উদ্যোগী হয়ে শ্রম দেয়া। তারা নিজেদের পারিবারিক অর্থনীতি এবং সেই সাথে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিতে অবদান রাখছেন। বস্তুত ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ এই পাঁচ বছর জাতীয় উৎপাদে প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের উপর, পরবর্তী তিন বছর (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮) ৭ শতাংশের উপর এবং ২০১৮-১৯ অর্থাৎ করোনা মহামারির আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়। এই ধারাবাহিক উল্লেখযোগ্য অর্জন উদাহরণ সৃষ্টিকারী। এমনকি করোনাকালেও বাংলাদেশের উদাহরণ সৃষ্টি করা চলমান থাকে। এ সময় পৃথিবীর স্বল্প সংখ্যক দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়, বাংলাদেশ সেগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ সালে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২০-২১ সালে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

হঠাৎ করোনা মহামারি মোকাবেলা করার জন্য পৃথিবীর কোনো দেশই প্রস্তুত ছিলনা। বলাবাহুল্য বাংলাদেশও না। প্রথম দিকে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে এই মহামারি মোকাবেলা করা শুরু করে। তবে দ্রুতই স্বাস্থ্য সেবা (টিকা দেওয়া, পরীক্ষা করা, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করা ও চিকিৎসা দেয়া) দিকটায় উন্নতি হতে থাকে। তাই দ্বিতীয় ধাক্কা যথেষ্ট দক্ষতার সংগে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। টিকা সংগ্রহ ও দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারনভাবে সফল। যাদের টিকার আওতায় আসার কথা তাদের প্রায় সবাইকে ইতোমধ্যে টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নশীল অনেক দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকায়, এখনও এক্ষেত্রে তেমন সফল হয়নি।

এছাড়াও করোনাকালে বাংলাদেশ সরকার এবং সক্ষম ও আগ্রহী অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিধিনিষেধ ও লকডাউনের কারণে কাজ হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অসংখ্য মানুষের পাশে দাঁড়ায়। উল্লেখযোগ্য কোনো বিপর্যয় ছাড়াই অবস্থা সামাল দেয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে করোনা মহামারি থেকে বাংলাদেশে উত্তরণ ঘটেছে বলা যেতে পারে এই আশা করে যে, আর কোনো করোনা ঢেউ আসবে না। তবে এ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয়তা নাই।

ফিরে আসি অর্থনৈতিক বিষয়ে। মাথাপিছু আয় ২০১০ সালে ছিল ৭৮১ মার্কিন ডলার, যা বেড়ে ২০২২ সালে হয় ২,৮২৪ মার্কিন ডলার (পরিকল্পনা মন্ত্রীর ১০ মে ২০২২ তারিখে ঘোষণা অনুযায়ী)। এটা নিশ্চয়ই ঈর্ষণীয় অর্জন। কিন্তু অবশ্যই মাথাপিছু গড় আয় অনেক কিছু প্রকাশ করে না। আয় বিভাজন এবং আয় বৈষম্য থেকে যায় আড়ালে। তাই আসল জনভিত্তিক চিত্র জানতে হলে আয় বৈষম্য বিবেচনায় নিতে হবে। তদুপরি বহুমাত্রিক বৈষম্য বিবেচনা জীবনমান সংক্রান্ত বাস্তবতা অধিক পরিষ্কার করে। আমি এখানে শুধু আয় বৈষম্যের কথা উল্লেখ করতে চাই।

বাংলাদেশে আয় বৈষম্য বাড়ছে তা স্বীকৃত, সরকারি তথ্যেই তা দেখা যায়। বৈষম্য পরিমাপক সূচক জিনি সহগ ২০১০ সালে ছিল শুণ্য দশমিক ৪৫, তা বেড়ে ২০১৮ সালে হয় শুণ্য দশমিক ৪৮। করোনাকালে হয়ত আরো বেড়েছে, কিন্তু আমার কাছে সেই তথ্য নেই। যাই হউক, শুণ্য দশমিক ৪৮ উদ্বেগজনক বৈষম্য নির্দেশক। তবে বৈষম্য আরো বেশি হতে পারতো যদি শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেয়া হতো। নব্য-উদারতাদের তাগিদ অনুসারে সবকিছু বাজারের কাছে ছেড়ে না দিয়ে দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্তদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রতিবছর। জাতীয় উৎপাদের আড়াই শতাংশের মত সাধারণত ব্যয় করা হয় এই খাতে। সঙ্গত কারণে করোনাকালে এখাতে আরো বেশি ব্যয় করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিখাত দারিদ্র্য নিরসনে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে – খাদ্য সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিকাজের মাধ্যমে। বছর বছর কৃষিতে সরকার উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান ভর্তুকি ও ঋণ দিয়ে থাকে। কৃষিখাতের সফলতার জন্য করোনাকালে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য সংকটে পড়ে নাই। এছাড়া, মূলত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কুটির ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিভিন্ন সূচকে করোনাপূর্বকালে বাংলাদেশের লক্ষ্যনীয় উন্নতি রয়েছে: দারিদ্র্য হ্রাস (২০০০ সালের প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৯-এ ২০ দশমিক ৫ শতাংশ), নারি শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অনুপাত ছেলেদের চেয়ে বেশি), নারির ক্ষমতায়ন (পথ অনেক বাকি থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সর্বাগ্রে), শিশু মৃত্যুর হারে প্রভুত উন্নতি (২০২০-এ হাজার জীবন্ত ভুমিষ্ট শিশুর মধ্যে এক বছরের কম বয়সে ২৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সে ২৯ জন), মাতৃমৃত্যুর হারেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সম্প্রতি মানব উন্নয়ন সূচকেও কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

এখানে শেখ হাসিনার সরকার ফ্রিড্রিক হায়েক নয়, বরং এডাম স্মিথ ও জন ক্যাইন্স-এর ধারণা অনুযায়ী বাজার অর্থনীতির পাশাপাশি দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া এবং পিছিয়েথাকাদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। তবে বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করলে অর্থনীতি পরিচালনায় ব্যাপক মানবকেন্দ্রিক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের অন্য স্তম্ভ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের তৎপরতা ও স্বকীয়তা উঁচুমাত্রার, যা বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রশংসিত। বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্য আয়ের জলবায়ু ভঙ্গুর দেশ। এই ভঙ্গুরতার মূল উৎস দেশটির ভৌগলিক অবস্থান। তিনটি বড় নদী অববাহিকার–গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা– নিম্নে এই বদ্বীপ রাষ্ট্রের অবস্থান। দক্ষিণ সীমানায় অথৈ বঙ্গোপসাগর। দেশের তিন-চতুর্থাংশের উচ্চতা সমুদ্রপীঠ থেকে মাত্র অনধিক ১৫ ফুট। দেশটি অনেক নদ-নদী অধ্যুষিত এবং দেশের ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল রয়েছে। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ বন্যা প্রবণ এবং বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল সময় সময় উজান থেকে ঢল নেমে হঠাৎ প্লাবিত হয়। একই সঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চল খরায় আক্রান্ত হয়। দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিশাল পানি প্রবাহের ৯২ শতাংশই দেশের বাইরে উজান থেকে আসে, মাত্র ৮ শতাংশ দেশেজ। বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্দেশীয় নদীর সবগুলোই উপর থেকে বাংলাদেশে নেমে এসেছে–৫৪টি ভারত থেকে এবং ৩টি মায়ানমার থেকে। ভৌগলিক বাস্তবতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এছাড়াও রয়েছে জনসংখ্যার বিশালত্বের চ্যালেঞ্জ। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২৬৫ জনের বাস কিন্তু তা ভারতে ৪৬৪ জন, পাকিস্তানে ২৮৭ জন, নেপালে ২০৩ জন, থাইল্যান্ডে ১৩৭ জন, ভিয়েতনামে ৩১৪ জন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪৯ জন, চীনে ১৫০ জন, যুক্তরাজ্যে ২৭৮ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬ জন এবং রাশিয়ায় ৯ জন।[৭] অবশ্য জনমিতিক সুযোগ থাকায় যথাযত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি তরান্বিত করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তণের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার প্রকোপ আগের তুলনায় ঘন ঘন ও অধিক বিধ্বংসীরূপে ঘটছে। খরা ও নদী ভাঙ্গন বাড়ছে, সমুদ্রপীঠ উঁচু হচ্ছে এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বাড়ছে। অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্ত হচ্ছে। এবার সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক এলাকাজুড়ে ফ্লাস বন্যা ঘটেছে (এখনও বিদ্যমান)। ২০১৭ সালেও এত বিধ্বংসী না হলেও একটি গুরুতর ফ্লাস বন্যার আবির্ভুত হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়া জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খুবই তৎপর।

স্মর্থ্যব্য, বাংলাদেশ অতি সামান্য গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ করে (বছরে বিশ্বে মোট নি:সরণের মাত্র এক শতাংশের এক তৃতীয়াংশ), কাজেই জলবায়ু পরিবর্তণের জন্য বাংলাদেশ মোটেই দায়ী নয়। কিন্তু উঁচুমাত্রার জলবায়ু ভঙ্গুর দেশ হওয়ায় ব্যাপকভাবে ভুক্তভোগী। জলবায়ু পরিবর্তণের কারণে ক্রমবর্দ্ধমান বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঘূর্নীঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, খরা) অভিঘাত মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের মত বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করা উন্নত বিশ্বের নৈতিক দায়িত্ব।

বস্তুত জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, কাজেই এর সমাধান কোনো দেশ একা করতে পারবে না, আর বাংলাদেশের মতো সীমিত সামর্থ্যের কোনো দেশ তো নয়ই।। উন্নত বিশ্ব এবং অধিক গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণকারী দ্রুত শিল্পায়নে সচেষ্ট বড় উন্নয়নশীল দেশসমূহ গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রুত কমিয়ে এনে যেন উষ্ণায়ন পরিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করে সেই বিষয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খুবই সোচ্চার। বিশ্ব পরিমন্ডল যাতে উন্নয়নশীল, বিশেষ করে জলবায়ু ভঙ্গুর দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এ সকল বিষয়েও বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে এবং জোরালো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছেন। এজন্য তাকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ান অব দি আর্থ' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ অঙ্গীকার সহকারে সচেষ্ট। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি এটাকে পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। একটি জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল গঠন করা হয় ২০১০ সালে। প্রতি বছর এই তহবিলে বাজেট থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়, যা সারা দেশে প্রধানত: বিভিন্ন অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এই তহবিলে ৩,৬৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং তখন পর্যন্ত ৩৩৯টি সরকারি এবং ৫৭টি বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।[৮] এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন উদ্ভূত পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক মোকাবেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। ২০২০ সালে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ এসব কাজের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল থেকে ভুক্তভোগী দেশগুলোকে দেয়া জলবায়ু অর্থায়ন এখন পর্যন্ত স্বল্পই। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পেয়েছে সামান্যই। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বছর বছর বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নিজ সম্পদে এই ক্রমবর্ধমান অভিঘাত কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে না। উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা লাগবে, যা প্রয়োজন মাফিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না। আগেই বলেছি এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দাবি উত্থাপনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ কাজ করছে এবং খুবই সোচ্চার রয়েছে।

করোনা মহামারি পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বাংলাদেশে যথেষ্ট সাবলিলভাবে শুরু হয়। ২০২১-২২ সালে জাতীয় উৎপাদে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ হয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কর্ম চাঞ্চল্য বেড়েছে। অসুবিধাগ্রস্থদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অওতায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আগামী বাজেটে এ ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেয়া ও যৌক্তিকভাবে বরাদ্ধ বাড়ানো বাঞ্চনীয়। অবশ্য বরাদ্ধকৃত অর্থের যাথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে সব কর্মরত মানুষের ৮৫ শতাংশ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। সরকারি-সহ আনুষ্ঠানিক সকল খাতে মাত্র ১৫ শতাংশ। তাই অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহ করোনা-পরবর্তী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় বিশেষ নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা সমর্থনের দাবি রাখে । এদের কাছে প্রণোদনা ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে পৌঁছানো যায় না, আমরা গত দু বছরে তা বাস্তবে দেখেছি। যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক কৃষক, কুটির ও অতিক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করছে তাদের মাধমে এদের কাছে প্রণোদনা পৌঁছানো সম্ভব এবং সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে নানা কর্মে নিয়োজিত ৮৫ শতাংশের পুণর্জাগরণ দেশে দারিদ্র নিরসনে ভূমিকা রাখবে এবং দেশের অর্থনীতির ভিত্ত শক্ত করতে সহায়ক হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি সীমিত, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। করোনাকালে বাল্যবিবাহের কারণে অসংখ্য মেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে আর ছেলেদের মধ্যে সে রকমটি ঘটেছে নিজের ও পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে। শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের সমাধান করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট রয়েছে। তবে যারা ঝরে পড়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা কতদূর সম্ভব তা আগামীতে দেখা যাবে। দেশের ভবিষৎ নির্মাণে যথাসময়ে বর্তমান শিক্ষার্থীরাই অবদান রাখবে, তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব-ভিত্তিক কার্যকর তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং বরাদ্ধকৃত অর্থ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে কাজে লাগাতে হবে ।

ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে সব হিসাব উলট পালট করে দিয়েছে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে সারাবিশ্বে সবকিছুর মূল্য বেড়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। এর একটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রীর (খাদ্য দ্রব্য, জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সার, যন্ত্রপাতি) উৎপাদন ও সরবরাহে বিশ্বব্যাপী সংকট সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে। সরবরাহ সংকটের মধ্যে রয়েছে জাহাজে স্থান সংকুলানে ঘাটতি এবং জাহাজে পণ্য পরিবহনের খরচ বেড়ে যাওয়া। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত। এই যুদ্ধ চলতে থাকলে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে। এই টালমাটাল বিশ্ব বাস্তবতার অভিঘাত বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে।

সম্প্রতি করোনা পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুণর্জাগরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের আমদানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। রফতানিও বেড়েছে তবে অনেক কম । আমদানি যেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ছিল ৫০ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা ২০২১-২২ সালের একই সময়ে ৪২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে রফতানি একই সময়ে বেড়েছে ৩২ দশমিক ৯ বিলিয়ন থেকে ৪৩ দশমিক ৭ বিলিয়নে (৩২ দশমিক ৮ শতাংশ)। ২০২০-২১ থেকে ২০২১-২২-এ বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৩ বিলিয়ন থেকে ২৭ দশমিক ৭ বিলিয়নে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চলতি হিসাবে ঘাটতি ২০২০-২১-এর ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০২১-২২-এ ১৮ দশমিক ৮ বিলিয়ন হয়েছে।[৯]

আমদানি বাড়ার প্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল থেকে খরচ বেশি হচ্ছে। তবে এখনও এই তহবিলে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত স্থিতি আছে। একটি কথা মনে রাখতে হবে - এই স্থিতি থেকে খরচ যেমন হচ্ছে তেমন এতে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে রফতানি আয় ছাড়াও রেমিট্যান্স, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রাপ্তি । কাজেই খরচ হবে, আবার স্থিতিও বাড়বে। যোগ-বিয়োগ চলবে, তবে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। বৈদেশিক মুদ্রার যে পরিমাণ স্থিতি এখন আছে তা খুবই স্বস্থিদায়ক- তা দিয়ে পাঁচ-ছয় মাসের আমদানি ব্যয় সংকুলান করা যাবে। তাই এ বিষয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। শ্রীলঙ্কার বিদ্ধস্ত অবস্থার সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের তুলনা করা অবান্তরই মনে হয় আমার কাছে। তবে যথাযত পদক্ষেপের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল যাতে অব্যাহতভাবে স্বস্তির জায়গায় থাকে সেই প্রচেষ্টা করা হবে সুবিবেচনাপ্রসুত।

ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে অব্যাহত কার্যক্রমের সঙ্গে কিছু নতুন পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়েছে। রফতানি বাড়ানোর লক্ষ্যে রফতানিকারকদের সঙ্গে সরকার কাজ করছে। প্রচলিত রফতানি পণ্যসমূহের (যেমন তৈরী পোষাক, নিটওয়ার) নতুন নতুন গন্তব্য চিহ্নিতকরণ এবং নতুন রফতানি দ্রব্য বা কম রফতানি হয় এমন দ্রব্যের রফতানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রচলিত নীতির মধ্যে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ আরো জোরদার করতে হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য এবং সাধারণভাবে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য এবং কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি জরুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির (যেমন পেঁয়াজ) সীমিত আমদানি এগুলোর দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায় । তবে দেশে এসকল পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেয়া বাঞ্চনীয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির অপ্রয়োজনীয় বা বর্জন করা যায় এমন বিদেশ ভ্রমণ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তা কার্যকরভাবে যেন বাস্তবায়ন করা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

অনিহা থাকতে পারে, যোগসাজসও - উভয়ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অপতৎপরতা শক্ত হাতে দমন করতে হবে। অপ-ইনভায়সং-এর মাধ্যমে অর্থপাচার রোধে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি করা ছাড়া রেমিট্যান্স বিনিয়োগ এবং নানা পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে বিগত অনেক বছর ধরে। করোনাকালেও ধারাবাহিকভাবে বাড়ার পর সম্প্রতি রেমিট্যান্স প্রবাহে কিছুটা অবনমন ঘটেছে। এর একটি কারণ হতে পারে করোনা পরিস্থিতির প্রশমন হওয়ায় বিভিন্ন কারণে (চিকিৎসা, ব্যবসা, ভ্রমণ) অনেক মানুষ বিদেশ যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কার্ব মার্কেটে বিস্তর বেড়ে যাওয়ায় খোলাবাজারে টাকার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের প্রেক্ষিতে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা বেড়ে যাওয়া। আইনসংগত পদ্ধতিতে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করতে ইতোমধ্যে প্রণোদনা ২ (দুই) শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর সুফল কিছুটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে কার্ব মার্কেটকে নজরদারিতে রাখতে হবে।

আগামী দিনে রেমিট্যান্স বাড়াতে উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন জনবল যাতে বিদেশে যায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এ বিষয়টি সরকারের গৃহীত নীতির আওতায় আছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং বিদেশে কাজের জন্য গমনেচ্ছুদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি।

ওপরের আলোচিত অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিগত মাসগুলোতে আমদানি চাহিদা প্রচুর বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে আমদানি ঋণপত্র (এলসি) খোলার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় টাকার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তা স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ হিসেবে এ সময়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের অধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে বিক্রি করে। বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের স্থিতি অব্যাহতভাবে স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রাখতে হবে, তাই যখন তখন অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এভবে বিক্রি করা সম্ভব হবে না। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে যাতে ভারসাম্য থাকে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ (কয়েকটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে) অব্যাহতভাবে নেওয়া জরুরি ।

বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ঋণ নেয়। ঋণ নেয়ার প্রয়োজন কমিয়ে আনতে হলে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর কথা দীর্ঘদিন ধরে বহুল উচ্চারিত এবং আলোচিত বিষয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি তেমন হয়নি, বিশিষ করে জাতীয় উৎপাদের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশে কর-জাতীয় উৎপাদ অনুপাত ৯ শতাংশের মত। ভিত্তি বছর পরিবর্তনের পর তা নেমে গেছে ৭ দশমিক ৭ শতাংশে। ভারতে[১০] তা ১১.৭ শতাংশ এবং নেপালে[১১] ১৯.৮ শতাংশ।

অথচ বাংলাদেশে অতিধনীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এ দেশে কর দেয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠে নাই, বরং বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে প্রণোদনা নেয়ার সংস্কৃতি ক্রমশ: জোরদার হচ্ছে। আসলে এখানে মূল্যবোধের সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তাগিদ হচ্ছে দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই ঘটছে, কেননা যাদের বেশি আছে এবং ক্ষমতা আছে তারাই নানা ছুতোয় নেয়ার মোহ এবং প্রদেয় কর প্রদানে অনীহায় ভুগছে। এই চক্র ভাঙ্গার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং শেখ হাসিনার কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে।

বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুবই স্বস্তির জায়গায় আছে। অর্থমন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পর্ক বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ স্থিতি ছিল জাতীয় উৎপাদের মাত্র ১২ দশমিক ২৩ শতাংশ; ৫০ শতাংশের উপরে গেলে চিন্তা করার প্রয়োজন হতে পারে। আরো সুখবর হচ্ছে ঋণ পরিশোধ (গৃহীত ঋণ ও সুদ) গত মার্চ মাসে ছিল রফতানি আয়ের মাত্র ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ। এই অনুপাত বিগত ২/৩ বছরে সাধারণত ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। অবশ্য কিছু কিছু ঋণের পরিশোধ করতে হবে না এমন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে পরিশোধ করার পরিমাণ নিকট আগামীতে কিছু বাড়বে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা এতটাই স্বস্থিজনক যে, তাও কোনো চিন্তার কারণ হবে না । অবশ্য আগামীতে বিদেশী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চৌকষ ব্যবস্থাপনা হিসেবে গণ্য হবে, বিশেষ করে যেহেতু স্বল্পোন্নত তকমা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক ঋণের জন্য বাংলাদেশকে বেশি হারে সুদ দিতে হবে। আর যে সমস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে দ্রুত সফলতা পাওয়া যাবে বা যেগুলো কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে সেই সকল প্রকল্পকে বৈদিশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈদিশিক ঋণ গ্রহণ কৌশল নির্ধারণ করা উচিত।

দেশের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ দানা বাঁধছে বলে দেখা যাচ্ছে। এটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি । আগেই তথ্য দেওয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশে এখনও অন্যান্য অনেক দেশ (উন্নত ও উন্নয়নশীল) থেকে মূল্যস্ফীতি কম আছে। তবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যেভাবে পণ্য-মূল্য বাড়ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ যে সকল পণ্য অনেক আমদানি করে (যথা: জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল, গম, সার, বিভিন্ন মধ্যবর্তী ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট দ্রব্য) সেগুলোর দাম এবং জাহাজে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় (আমাদের আমদানি মূল্য+পরিবহন ভিত্তিতে করা হয়) বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বাড়বে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়া সিলেট অঞ্চলে সাম্প্রতিক বড় বন্যার ফলে চালের সরবরাহে চাপ সৃষ্টি হতে পারে যা চালের মূল্য বৃদ্ধির একটি কারণ হতে পারে। এমনিতেই চালের দাম অনেক বেড়েছে। অবশ্য সরকারের

নিশ্চিতকরণে এই কর্মসূচী যৌক্তিকভাবে সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে সবশেষে বহুল উচ্চারিত একটি কথা আবার বলতে চাই আর তা হচ্ছে: দেশে সরবরাহ থাকলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মজুদদারি করে এবং নানা অজুহাত দেখিয়ে কৃত্রিমভাবে সরবরাহ সংকট তৈরী করে নিত্য প্রয়োজনীয় ভৌগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়। এদেরকে নজরদারিতে রেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।

শেষের কথা

আমি বক্তব্যের শুরুর দিকে পদ্মাসেতুর কথা উল্লেখ করেছিলাম। শেষ করতে চাই আবার এই সেতু সম্বন্ধে কিছু কথা বলে। আগামী ২৫ জুন (২০২২) এ সেতুর উদ্বোধন করবেন নিজস্ব অর্থায়নে এই বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঐ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, বিশ্বব্যাংক এটি নির্মাণে অর্থায়ন করবে না বলে জানিয়ে দেয়ার পর। এখানে দুর্নীতি হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক সেতুটি নির্মাণে অর্থায়ন করবে না বলে জানায়। পরবর্তীতে কানাডার কোর্টে পরাজিত হয়ে ঐ ভুয়া অভিযোগের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় বিশ্বব্যাংককে।

এখন একটি অভিযোগ আছে, দীর্ঘসূত্রীতার কারণে এই সেতু নির্মাণে সময় বেশি লেগেছে এবং খরচ বেশি হয়েছে। নিজস্ব অর্থ ও নিজ দায়িত্বে এত বড় কাজ সম্পাদন করতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হতেই পারে। তবে এখন পদ্মাসেতু বাস্তব সত্য। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা মূল্যায়নে দেখানো হয়েছে যে, এ সেতুর ফলে জাতীয় উৎপাদ এক শতাংশের অধীক বাড়বে। উল্লেখ্য, এই ঘন বসতির দেশে নিশ্চয়ই সেতুটির বহুল ব্যবহার হবে। পণ্য ও উপকরণ উভয় অভিমুখে পরিবহন প্রচুর হবে, যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হবে। উঁচুমাত্রার ব্যবহার হলে সেতু নির্মাণে যে খরচ হয়েছে তা যৌক্তিক সময়ে উঠে আসবে। সেতুর উভয় দিকে আনুষঙ্গিক অনেক অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে উঠবে। সর্বোপরি এই সেতুর কারণে সারা দেশ দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত হবে এবং দেশের সকল অংশের মানুষের বহি:সংযোগ সহজতর হবে। সুতরাং এই সেতুর ফলে জাতীয় উৎপাদে বৃদ্ধি প্রাক্কলিত হারের চেয়ে অধিক হবে বলে আমার ধারণা। পদ্মাসেতু আমাদের গৌরবমন্ডিত অর্জন।

শেষ করি এই বলে যে, সকল বাধা মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব নন্দিত উন্নয়নের অধিকারী। আমি বিশ্বাস করতে চাই, পদ্মাসেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং এদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয়ের ধারক (দিন বদলের সনদ দ্রষ্টব্য) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সব প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধককে হটিয়ে সকলকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভূক্ত করে টেকসই উন্নয়নের ধারায় আমরা সোনার বাংলা গড়ার পথে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাব ।

পাদটীকা

1, 2 United Nations Brief No. 1, Global Impact of War in Ukraine of Food, energy and finance, 13, April 2022.

3 United State Inflation Rate April-2022 Data, 1914-2021 Historical May Forecast <https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi>

4 Eurozone Inflation hits now high as growth slows amid Ukraine war <https://www.aljazeera.com/economy/2022/4/29/eurozone-inflation-hits-new-high-as-growth-slows-amid-ukraine-war>

5 Office of National Statistics Consumer price inflation in UK, April 2022 <https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/april2022>

6 India Inflation Rate-April 2022 Data-2012, 2021 Historical May forecast<https://www.google.com/search?q=infkation+in+india&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-us&client=safari>

7. The World Bank/ Data- Population Density per sq km of land area FAO and World Bank population estimates), 2020. <wttps://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DHST?locations=CN>

8 বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (বিসিসিটি), পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

9. Forrest Cookson, 'What ia going on with Bangladesh's economy? Dhaka Tribune, 22 May 2022.

10 Tax-GDP ratio rises to 11.7%, The Hindu, New Delhi, 6 April 2022.

11. The World Bank/ DATA, Tax revenue (% of GDP)-Nepal <http:// data.worldbank.org/indicator/GC.TAX

অন্যান্য তথ্যসূত্র

১.অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ভবিষ্যৎ নির্মাণ" নূহ-উল-আলম লেলিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধ ও উত্তরকাল*, ঝুমঝুমি প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৩. Qazi Kholiquzzaman Ahmad, "SDGs, Climate Change and Future of Humanity", published in Sirajul Islam Quadir *et.al* (eds.), *Journal AmCham,* Volume 16, No. 1, January-March 2022, Dhaka.

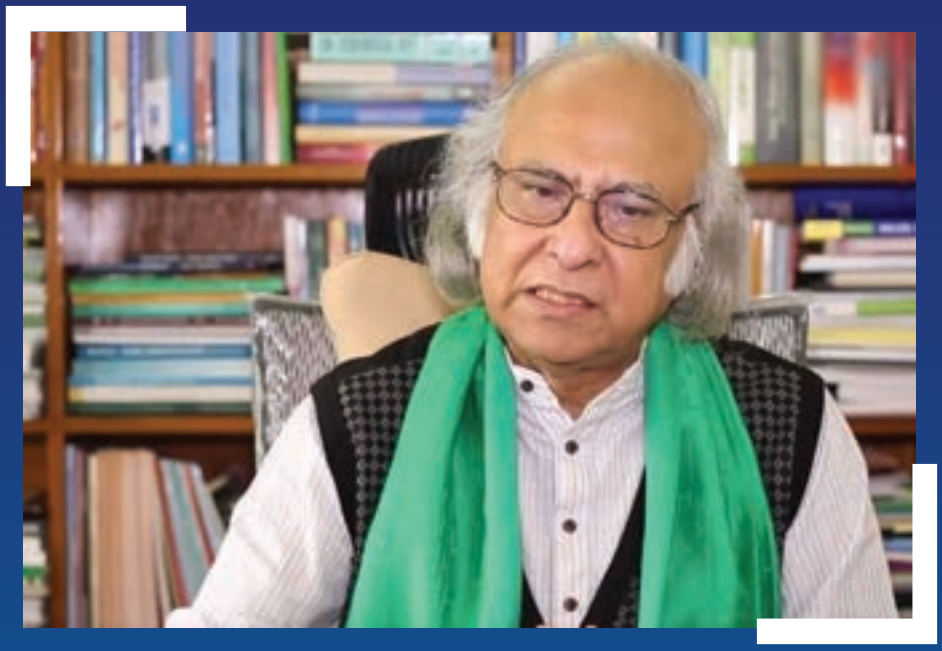

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ